# দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘দেবী চৌধুরাণী’ পাঠ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মাস্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ প্রভৃতি

আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, (১৩ই পৌষ) শুক্লা সপ্তমী তিথি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে। অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। মাস্টার ও প্রসন্ন আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার ঘরে দক্ষিণদিকে দালানে রহিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন।

ঠাকুর মাস্টারকে বললেন, “কই, বঙ্কিমকে আনলে না?”

বঙ্কিম একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেন্দ্র (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকরা ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া -- কেহ দাঁড়াইয়া। ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইষ্টকনির্মিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ-পশ্চমদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহাস্যে মাস্টারকে বলিলেন, “বইখানা কি এনেছ?”

মাস্টার -- আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- পড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি।

[*শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্তব্য*]

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক। পুস্তকের নাম “দেবী চৌধুরানী”। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরানীতে নিষ্কামকর্মের কথা আছে। লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমের সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। মাস্টার বলিলেন, “মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল, পরে হল দেবী চৌধুরানী। যে ডাকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক। ডাকাতটি বড় ভাল। সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন-ভজন করিয়েছিল। আর কিরকম করে নিষ্কামকর্ম করতে হয়, তাই শিখিয়েছিল। ডাকাতটি দুষ্ট লোকেদের কাছ থেকে টাকা-কড়ি কেড়ে এনে গরিব-দুঃখীদের খাওয়াত -- তাদের দান করত। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।”

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ও তো রাজার কর্তব্য।

মাস্টার -- আর-এক জায়গায় ভক্তির কতা আছে। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লর কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী। সে বলত, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল। প্রফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদনাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করে দিছল। তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়িতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও দুটি বিয়ে দিছল। প্রফুল্লর কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এইখানটা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে --

"নিশি -- আমি তাঁহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল -- একপ্রকার কি?

নিশি -- সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্রফুল্ল -- সে কিরকম?

নিশি -- রূপ, যৌবণ, প্রাণ।

প্রফুল্ল -- তিনিই তোমার স্বামী?

নিশি -- হাঁ -- কেননা, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। কখনও স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ -- স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।'

মূর্খ ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লের স্বামী) এত জানিত না!

বয়স্যা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত।'

এ-যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর -- এ-কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কার রূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দু-মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ-অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও তো বলিলে না?'

বয়স্যা বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছিলেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?

প্রফুল্ল -- দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি -- মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।”

[*আগে ঈশ্বরসাধন -- না আগে লেখাপড়া*]

মাস্টার -- ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন।

“প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসর আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন -- প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত।

“তারপর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ -- এর মানে কি জানো? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ-সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানির কাগজ -- এ-সব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? জো-সো করে -- স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকা-কড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে! খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম, তারপরে রামের ঐশ্বর্য -- জগৎ। তাই বাল্মীকি ‘মরা’ মন্ত্র জপ করেছিলেন। ‘ম’ অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর ‘রা’ অর্থাৎ জগৎ -- তার ঐশ্বর্য!

ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।